HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি

টপিক – ০১ জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

টপিক ০২: জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

টপিক ০৩: জাতিসংঘের কার্যকলাপ

টপিক ০৪: জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

টপিক ০৫: জার্মানিতে নাৎসিবাদ ও হিটলারের উত্থানের কারণ

টপিক ০৬: জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

টপিক ০১: জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত করে তুলে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। ইতোপূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জ (League of Nations) গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ লীগের গঠনতন্ত্রে কিছু ত্রুটি এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক স্বার্থে আন্তর্জাতিক আইন মানতে না চাওয়ার ফলে এ সংস্থাটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বিশ্ব আরেকটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে। এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বনেতৃবৃন্দ মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে
উঠেছিল সেসব সংগঠনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলনের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাতিসংঘ (The United Nations) সেই উদ্যোগের ফসল। প্রায় সাত দশক ধরে এ সংস্থাটি বিশ্বকে সংঘাতের কবল থেকে মুক্ত রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশও এক গর্বিত অংশীদার। গত তিন দশক ব্যাপী এদেশের সাহসী সেনা সদস্যগণ বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে সেবা প্রদান করে অপরিসীম অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বনেতারা যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য লিগ অব নেশনস গঠন করেন। সংঘর্ষ ও উত্তেজনা রোধে সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা এবং সৃষ্ট মানবতার বিপর্যয় বিশ্বনেতাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী মিত্রশক্তি পরবর্তীকালে যাতে যুদ্ধ ও সংঘাত প্রতিরোধ করা যায় এই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নানা ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয় এবং লিগ অব নেশনস-এর ধ্বংস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে অনেকবার মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতৈক্যে পৌছেন। ১৯৪১-১৯৪৫ সালের এই পথ পরিক্রমায় কিছু উল্লেখযোগ্য সম্মেলন, সনদ ও ঘোষণা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন-

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

লন্ডন ঘোষণা, ১৯৪১ (London Declaration, 1941)

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হলো লন্ডন ঘোষণা। জার্মানি কর্তৃক ব্রিটেনকে আক্রমণ করার প্রেক্ষিতে ইউরোপের ৯টি দেশের সরকার পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য লন্ডনের জেমস প্রাসাদে ১২ জুন, ১৯৪১ সালে যে ঘোষণা দেয় সেটিই লন্ডন ঘোষণা। এই ঘোষণায় উল্লেখ ছিল, স্থায়ী শান্তির জন্য আগ্রাসনমুক্ত এবং সবার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিশ্ব প্রয়োজন, যেখানে স্বাধীন এবং মুক্ত মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা অর্জন সম্ভব। এটি ছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

আটলান্টিক সনদ, ১৯৪১ (Atlantic Charter, 1941)

আটলান্টিক সনদ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের দ্বিপাক্ষিক গোপন আলোচনার ফসল। ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে 'অগাস্টা' ও 'প্রিন্স অব ওয়েলস' রণতরিতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট এই সনদে স্বাক্ষর করেন। এই সনদে আটটি প্রস্তাব ছিল। আটলান্টিক সনদকে বিশ্বের ২৬টি দেশ সমর্থন করেছিল। "লন্ডন ঘোষণার পর আটলান্টিক সনদ প্রথম পৃথিবীর মানুষকে সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

এই সনদে ছিল ৮টি নীতি যা নিম্নরূপ-

১. কোনো দেশ বা জাতি ভবিষ্যতে আধিপত্য বিস্তার বা সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

২. স্বনির্ভর জাতি তার জনগণের ইচ্ছা অনুসারে স্বাধীন সরকার গঠন করতে পারবে।

৩. প্রতিবেশী দেশের সম্মতি ছাড়া কোনো দেশের সীমারেখা চিহ্নিত করা যাবে না।

৪. বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সমান বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থাকবে।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

৫. নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট শক্তির পতনের পর প্রতিটি দেশ নিজেদের উন্নতির জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বিদেশি আক্রমণ মোকাবিলার জন্য কাজ করবে।
৬. প্রতিটি দেশ উন্নত জীবনযাত্রা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে কাজ করবে।
৭. প্রতিটি দেশ সৈন্য, যুদ্ধজাহাজ, বিমান ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ কমাবে, এবং
৮. সমুদ্রপথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের সুযোগ থাকবে।
এই সনদে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেমন- GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

ওয়াশিংটন সম্মেলন, ১৯৪২ (Washington Conference, 1942)

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে 'United Nations Declaration' এ স্বাক্ষর করে তাতে Atlantic Charter অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে আরও ২২টি দেশ এতে অনুমোদন দেয়। এ সম্মেলনেই প্রথম United Nations শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তিনবার মিলিত হয়েছিলেন। তারা প্রথম মিলিত হন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে এবং এই সম্মেলন জানুয়ারি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সম্মেলনে মিত্রপক্ষের যুদ্ধকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। আর এই সম্মেলনের ছদ্মনাম (Code Name) ছিল ARCADIA। দ্বিতীয় সম্মেলনটি ছিল মূলত মিত্রবাহিনীর উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ সংক্রান্ত। এটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালের জুনে। আর তৃতীয় সম্মেলনটি হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে। এটি ছিল ইতালি অভিযান, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং জার্মানিতে বিমান আক্রমণ সংক্রান্ত। তৃতীয় সম্মেলনের ছদ্মনাম ছিল TRIDENT।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

মস্কো সম্মেলন, ১৯৪৩ (Moscow Conference, 1943)

১৯৪৩ সালের ১৮-৩০ অক্টোবর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা একটি যৌথ ইশতেহার প্রকাশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট কর্ডেল হাল (Cordell Hull), ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টনি এডেন (Anthony Eden), রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডি. মলোটোভ (Vyacheslav Molotov) এবং মস্কোস্থ চীনের রাষ্ট্রদূত ফু পিং স্যাং স্ব-স্ব দেশের পক্ষে এ ইশতেহারে স্বাক্ষর করেন। এ ইশতেহারের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়, "আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমিকতা ও সমতার ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এ চার শক্তি স্বীকার করছে।" এ ঘোষণার মাধ্যমে মিত্রপক্ষের চার প্রধান শক্তি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। একই বছর তেহরান সম্মেলনেও জাতিসংঘের কার্যকারিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

মস্কো সম্মেলন

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

তেহরান সম্মেলন, ১৯৪৩ (Tehran Conference, 1943)

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের কূটনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের অভিপ্রায় সংবলিত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এ ঘোষণায় বলা হয়, এই সংগঠন সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌম সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। নভেম্বরে রাশিয়ার স্ট্যালিনের সাথে চার্চিল ও রুজভেল্ট তেহরানে মিলিত হয়ে সকল রাষ্ট্রকে সংগঠনে যোগদানের ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেন। তারা অভিমত দেন যে, তাদের বিবৃতি বিশ্বে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

ব্রেটন উডস সম্মেলন, ১৯৪৪ (Bretton Woods Conference, 1944)

১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস শহরে বিশ্বের ৪৪টি দেশ মিলিত হয়। বিশ্ব অর্থনীতির ভঙ্গুর অবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য তারা দুটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। এরই প্রেক্ষিতে IMF ও IBRD প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য এ প্রতিষ্ঠান দুটিকে অনেক সময় ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

ডাম্বারটন ওক্স ও ইয়াল্টা সম্মেলন, ১৯৪৪ (Conference of Dumbarton Oaks & Yalta, 1944)

১৯৪৪ সালের ২১ আগস্ট থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ওয়াশিংটনের অদূরে ডাম্বারটন ওক্স এ বৃহৎ শক্তিবর্গ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিমূলক বিশেষ সম্মেলনে মিলিত হয়। এ বৈঠকে জাতিসংঘের রূপরেখা নিয়ে আলোচনার সময় 'ভেটো' (Veto) বা নিরাপত্তা পরিষদে একক বিরোধিতায় কোনো প্রস্তাব নাকচ করার অধিকার নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অন্তর্ভুক্ত সব প্রজাতন্ত্রের জন্য পৃথক ভোটাধিকার দাবি করলে সমস্যা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত এ সম্মেলনে স্থির হয় যে, জাতিসংঘের কাঠামো, উদ্দেশ্য ও আইনবিধি ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য অদূর ভবিষ্যতে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হবে।

সে মোতাবেক ক্রিমিয়ার ইয়াল্টায় ১৯৪৫ সালের ৪ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিন কর্তৃক ডাম্বারটন ওক্স সম্মেলনের প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়। এতে রাশিয়ার প্রস্তাব মতো বাইলোরুশিয়া ও ইউক্রেনকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সম্মেলনে স্থির হয়, ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘের নির্বাহী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে জাতিসংঘ সনদ (United Nations Organization's Charter) প্রণীত হবে।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন, ১৯৪৫ (Conference of Sanfrancisco, 1945)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন প্রায় শেষের দিকে। মিত্রপক্ষের জয়লাভ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এরূপ সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে যে সব রাষ্ট্র অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল তাদের সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ৫০টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এ সম্মেলনে মিলিত হয়।

১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল শুরু হয়ে এ সম্মেলন শেষ হয় ২৬ জুন জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে। উল্লেখ্য পোল্যান্ড সম্মেলনে উপস্থিত না থেকেও ৫১তম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হয়। ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদের সাক্ষর করে। ৫টি বৃহৎ শক্তি (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন)-এর অনুমোদনের পর ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যক্রম শুরু হয়। এজন্য প্রতিবছর পৃথিবীর সব রাষ্ট্র ২৪ অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি

টপিক – ০২ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

টপিক ০২: জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

উদ্দেশ্য (Aims)

জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আমরা সম্মিলিত জাতিসমূহের সদস্যরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে, যে যুদ্ধ দুবার মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করেছে, তা থেকে রক্ষা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংঘ যার নাম 'জাতিসংঘ' তা গঠন করলাম।"

জাতিসংঘ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য-

ক) রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিহার করে সমস্যার সমাধান করা;

খ) মানবজাতির কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য উদ্যোগ নেয়া;

গ) নতুন প্রতিষ্ঠিত সব রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণের পথ খোলা রাখা।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

জাতিসংঘের গঠন (Formation of the UN)

বিশ্বের সব স্বাধীন জাতিসমূহ নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। শুরুতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। মোট ৬টি সংস্থার সমন্বয়ে জাতিসংঘ গড়ে ওঠে। এগুলো হলো:

১. সাধারণ পরিষদ (General Assembly);
২. নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council);
৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council);
৪. অছি পরিষদ (Trusteeship Council);
৫. আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) এবং
৬. সচিবালয় (Secretariat)

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

সাধারণ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি (Formation and Activities of General Assembly)

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশের ৫ জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। তবে প্রতিটি দেশের ভোট একটি করে। একজন সভাপতি, ২১ জন সহ-সভাপতি এবং ৭ জন স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিয়ে এ পরিষদ গঠিত। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য সাধারণ পরিষদের কমিটি রয়েছে। যেমন: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি, অর্থনীতি সংক্রান্ত কমিটি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কমিটি, শাসনতান্ত্রিক ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কমিটি, আইন সংক্রান্ত কমিটি। প্রতি বছর এ পরিষদ একবার অধিবেশনে মিলিত হয়। তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে বিশেষ জরুরি সভা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য চাইলে বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। এ সভায় জাতিসংঘ সনদের এখতিয়ারভুক্ত সব বিষয় আলোচনা করা যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এভাবে গৃহীত প্রস্তাব তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের সম্মতি এবং নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর করা যায়। শুরুতে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ছাড়া এ সভা কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারত না। তবে ১৯৫০ সালে 'Unite for Peace' সিদ্ধান্তটি গৃহীত হওয়ার পর থেকে সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়াও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি (Formation and Activities of Security Council)
জাতিসংঘের মূল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব এ পরিষদের। শুরুতে ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী সদস্য সাকুল্যে ১১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সাল থেকে ১০ জন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হয় ১৫ এবং ৯ জন সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তবে স্থায়ী ৫টি সদস্য রাষ্ট্রের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া যেকোনোটি ভেটো দিলে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। অস্থায়ী সদস্যগণ ২ বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন এবং কার্যাবলি (Formation and Activities of Economic and Social Council)

প্রতিষ্ঠাকালে ১৮টি সদস্য নিয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৪। এ পরিষদ প্রতিবছর দুইবার অধিবেশনে মিলিত হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার রক্ষা কর্মসূচি, নারীর অধিকার রক্ষা, ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, যুদ্ধের কারণে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী শ্রমিকস্বার্থ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে এ সংস্থা কাজ করে। এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সংস্থা রয়েছে। যেমন-শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (IMF)। এছাড়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য এ সংস্থার কতিপয় কমিশন রয়েছে। যেমন- ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE), ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান কমিশন (ECLAC), শিশু তহবিল (UNICEF), ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশন (UNRRA) ইত্যাদি। উপরিউক্ত সংস্থা ও কমিশনগুলোর মাধ্যমে এ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যূনতম মানবাধিকার রক্ষায় অবদান রেখে চলেছে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

অছি পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি (Formation and Activities of Trusteeship Council)
জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশেষ বিবদমান রাষ্ট্র বা অঞ্চলসমূহের প্রশাসনিক বিন্যাস, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা অছি পরিষদের দায়িত্ব। ১৯৪৫ সালে লীগ অব নেশনসের ম্যান্ডেটভুক্ত ১১টি দেশের দায়িত্ব নিয়ে এ পরিষদের কার্যক্রম শুরু হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যবর্গ ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত হয়। ষাট ও সত্তরের দশকে ম্যান্ডেটভুক্ত অঞ্চলগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে এ পরিষদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও কার্যাবলি (Formation and Activities of International Court of Justice)

এটি জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় সংস্থা। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন ইস্যুতে বিবাদ স্বেচ্ছায় মীমাংসায় রাজি হলে এ আদালতের মাধ্যমে তা নিষ্পন্ন করা হয়। ১৫ জন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকরা ৯ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নেদারল্যান্ডসের (হল্যান্ড) হেগ শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এ আদালতের সভাপতি ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। অতিসম্প্রতি বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত দাবির বিষয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ করে তার ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

জাতিসংঘের ভাষা' (Language of UN)

জাতিসংঘে বর্তমানে ৬টি ভাষা (আরবি, চায়নিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রুশ এবং স্প্যানিশ) অফিসিয়াল দলিলপত্র লেখা ও সভাগুলোতে ব্যবহার করা হয়। তবে বাংলা, হিন্দি, পর্তুগিজ, তুর্কি ও এসপারেন্টো ভাষাকে অফিসিয়াল ভাষা করার প্রস্তাব বিবেচনায় রয়েছে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

জাতিসংঘ সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলি (Formation and Activities of Secretariat of the UN)

জাতিসংঘের প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ইস্টার নদীর তীরে এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘের অন্যান্য অফিস সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ও অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অবস্থিত। একজন মহাসচিব (Secretary General), ও সাংগঠনিক কর্মীদের নিয়ে এ দপ্তর গঠিত।

মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ পরিষদের দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। মহাসচিব সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান, নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট প্রদান, নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ কার্যকর করা ইত্যাদি গুরুদায়িত্ব পালন করেন। জাতিসংঘের যাবতীয় রিপোর্ট রচনা, জাতিসংঘের বিভিন্ন পত্রিকা, বুলেটিন প্রকাশনা, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলোর তত্ত্বাবধান এ সচিবালয়ের কাজের অন্তর্ভুক্ত। ট্রিগভেলি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এর পূর্বে তিনি ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল মেয়াদে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

জাতিসংঘের সদর দপ্তর

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও গঠন

নং	নাম	দেশের নাম	দায়িত্ব পালনের সময়
১	ট্রিগভেলি	নরওয়ে	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ থেকে ১০ নভেম্বর, ১৯৫২
২	দ্যাগ হেমারশোল্ড	সুইডেন	১০ এপ্রিল, ১৯৫৩ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
৩	উ থান্ট	মিয়ানমার	৩০ নভেম্বর, ১৯৬১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
৪	কুট ওয়ার্ল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	১ জানুয়ারি, ১৯৭২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮১
৫	জাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	১ জানুয়ারি, ১৯৮২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯১
৬	ড. বুট্রোস ঘালি	মিশর	১ জানুয়ারি, ১৯৯২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
৭	কফি আনান	ঘানা	১ জানুয়ারি, ১৯৯৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৬
৮	বান কি মুন	দক্ষিণ কোরিয়া	১ জানুয়ারি, ২০০৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬
৯	অ্যান্তোনিও গুতেরেস	পর্তুগাল	১ জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে বর্তমান

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি

টপিক – ০৩ জাতিসংঘের কার্যকলাপ

টপিক ০৩: জাতিসংঘের কার্যকলাপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে। পূর্ববর্তী 'জাতিপুঞ্জ' এর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শুরু থেকেই জাতিসংঘের মাধ্যমে ছোট-বড় সব রাষ্ট্র বা জাতি একসাথে বসে আলোচনা করে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব আদর্শগত কারণে দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্ব অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। এ দুটো বলয়ের বাইরে অবশ্য কতিপয় দেশ একজোট হয়ে জোটনিরপেক্ষ বলয় সৃষ্টি করে। তবে এ তৃতীয় ধারাটি তেমন বলবান ছিল না। যাহোক, মার্কিন ও সোভিয়েত বলয়ের মধ্যকার ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাব জাতিসংঘের কার্যকলাপেও গভীর প্রভাব ফেলে।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

নিচে জাতিসংঘের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

১৯৪৬: ১৯৪৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় হল্যান্ডের (নেদারল্যান্ড) শক্তিপ্রয়োগ ও তার কার্যকলাপ নিয়ে সংকট শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড হল্যান্ডকে সমর্থন দান করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় হল্যান্ডের শক্তি প্রয়োগের নিন্দা জানায় এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার অধিকারকে সমর্থন দান করে। জাতিসংঘে এ বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু হলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।

একই বছর ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনীর কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সিরিয়া ও লেবানন অভিযোগ উত্থাপন করলে জাতিসংঘে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের কার্যকলাপের ব্যাপক সমালোচনা হয়। ফলে ইঙ্গ-ফ্রাঙ্কে বাহিনীদ্বয় সিরিয়া ও লেবানন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৬ সালের ২৪ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত এক বিশেষ কমিশন তৈরি হয়। এ কমিশন পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও বিস্তার রোধে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করে। সাধারণ অস্ত্রের প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

১৯৪৭: এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পারস্যে বুশ অধিকার এবং গ্রিসে ব্রিটেনের অধিকার সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদে মামলা। নিরাপত্তা পরিষদ যেন বিবাদী হয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারে সেজন্য রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) ভেটো প্রদান করে। একই বছর ব্রিটেন প্যালেস্টাইন সমস্যাকে জাতিসংঘে উত্থাপন করলে জাতিসংঘ নিযুক্ত কমিশন প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার সুপারিশ করে। এর ফলে 'ইসরাইল' নামক নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এ বছর সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদে যুদ্ধের প্রচারণাকে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাস হয়।

১৯৪৯: এ বছর চীনা কমিউনিস্টরা চিয়াং-কাই-শেক এর কুয়ো-মিন-তাং সরকারকে চীন থেকে বিতাড়িত করলে চিয়াং-কাই-শেক ফরমোজায় আশ্রয় নেন। রাশিয়া চীনের কমিউনিস্ট সরকারকে কুয়ো-মিন-তাং এর নির্বাসিত সরকারের পরিবর্তে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ দানের প্রস্তাব করলে মার্কিনি ভেটোর ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। ফরমোজায় চীন সরকারেরই সদস্যপদ বহাল থাকে। এর প্রতিবাদে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের সকল সভা ও কমিটি বর্জন করে। অবশ্য রাশিয়া এ জন্য পরবর্তীতে অনুতাপ প্রকাশ করে।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

১৯৫০: এ বছরই প্রথম বিরোধপূর্ণ দেশ বা অঞ্চলসমূহে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবাহিনী মোতায়েনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস হয়। এ বছরের জুন মাসে মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়। ১৯৫০ সালে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩৮০ অক্ষাংশ অতিক্রম করে আক্রমণ করলে নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার অনুপস্থিতির সুযোগে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস করে। নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে নিযুক্ত তার সৈন্যদলকে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠায়। ১৬টি দেশ জাতিসংঘের পতাকাতলে মার্কিন নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় সৈন্য পাঠায় এবং আরও ৪৫টি দেশ নানাভাবে সহায়তা করে। ভারত শুরুতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে তবে মার্কিনি চাপে শেষ পর্যন্ত একটি মেডিক্যাল টিম পাঠাতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে ফিরে এসে অভিযোগ করে যে, কোনো স্থায়ী সদস্যের অনুপস্থিতিতে জাতিসংঘের পতাকাতলে সৈন্য প্রেরণ বিধিসম্মত নয়।

অপরদিকে, পশ্চিমা জোট যুক্তি দেখায় যে, কোনো আন্তর্জাতিক সংকটের সময় কোনো স্থায়ী সদস্যদেশ অনুপস্থিত থাকতে পারে না। এ নিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে জাতিসংঘের সাধারণ সভা 'Unite for Peace' প্রস্তাব পাস করে। এ প্রস্তাবে বলা হয়। ভেটো প্রদানের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর থাকলে সাধারণ পরিষদ বিশেষ জরুরি অধিবেশন ডেকে বিষয়টি সুরাহা করতে পারবে। রাশিয়া অবশ্য এ প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছিল। এ সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

১৯৫৬: সুয়েজ খালকে মিশর জাতীয়করণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। ফলে এ বছর ইসরাইল মিশর আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরে সৈন্য পাঠায়। ফলে আমেরিকার উদ্যোগে সাধারণ সভায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ব্যাপক সমালোচনা হয়। ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য প্রেরণের তীব্র নিন্দা জানায়। শেষ পর্যন্ত সাধারণ পরিষদ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও আগ্রাসী দেশগুলোকে মিশর থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দান করে। দশটি নিরপেক্ষ দেশ থেকে ৫,০০০ সৈন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মিশরে পৌঁছলে বাধ্য হয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মিশর পরিত্যাগ করে। ইসরাইলও স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে দেয়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ বাহিনী মিশর ও ইসরাইলিদের মধ্যে বাফার হিসেবে কাজ করে। সুয়েজ খাল সংক্রান্ত ঘটনায় জাতিসংঘের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

১৯৬০: এ বছর জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় শান্তিরক্ষী দল আফ্রিকার কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে প্রেরিত হয়। এ বাহিনী কঙ্গোর স্বাধীনতা অর্জন ও জাতিগত বিরোধ নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

১৯৬৪: এ বছর সাইপ্রাসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী 'সাইপ্রাস ন্যাশনাল গার্ড' এবং 'তুর্কি-সাইপ্রিয়ট' বাহিনীদ্বয়ের মাঝখানে অবস্থান করে একটি বাফার জোন (Buffer Zone) গড়ে তোলে। এরপর জাতিসংঘ বাহিনী সাইপ্রাসে একটি তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন গঠন করে উভয় বাহিনীর মাঝে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে সক্ষম হয়।

১৯৭৪: নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মধ্যপ্রাচ্যের গোলান উপত্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিতে একটি আন্তঃপর্যবেক্ষণ মিশন গঠন করা হয়। এ বছর জুন মাসে এ মিশন তার কাজ শুরু করে।

১৯৭৮: এ বছর লেবানন সংকট দূর করতে জাতিসংঘের উদ্যোগে মার্চ মাসে অন্তর্বর্তীকালীন মিশন (United Nations Interim Force in Lebanon) গঠন করা হয়।

১৯৯১: ইরাক-কুয়েত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জাতিসংঘ এ বছর এপ্রিল মাসে ইরাক ও কুয়েতের সীমান্ত বরাবর একটি নিরাপদ এলাকা গঠনের জন্য UNIKOM (United Nations Iraq Kuwait Observation Mission) মোতায়েন করা হয়। এ বাহিনীর কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভূমি মাইন অপসারণ, ইরাক-কুয়েত সীমান্ত বরাবর নিরাপদ জোন তৈরি করে উত্তেজনা হ্রাস করা এবং যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন কার্যক্রম পরিচালনা। এ বছর পশ্চিম সাহারায় গণভোট অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করার জন্য MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) গঠন করা হয়।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

১৯৯৩: এ বছর জর্জিয়াতে পর্যবেক্ষক মিশন প্রেরণের জন্য UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) গঠিত হয়। একই বছর মোজাম্বিকের সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ অবসানের জন্য UNOMOZ নামে একটি শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণ করা হয়। এ মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৯২ সালের রোম শান্তি চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্রবিরতি পর্যবেক্ষণ করা।

১৯৯৫-৯৬: ১৯৯৫ সালে জাতিগত দাঙ্গা নিরসনে একটি রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক মোজাম্বিকে শান্তি মিশন প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৬ সালে 'প্রেভলোক' এ আরেকটি শান্তি মিশন প্রেরিত হয়।

১৯৯৯: ১৯৯৯ সালটি জাতিসংঘের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত সময় ছিল। এ বছর জাতিসংঘ কসোভোয় অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশন, সিয়েরালিয়নে পর্যবেক্ষক মিশন (UNAMSIL), পূর্বতিমুরে সাময়িক প্রশাসন গড়ে তোলা (UNTAET), কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে জাতিসংঘ অর্গানাইজড মিশন (MONUSCO) ইত্যাদি মিশন, প্রেরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

২০০০: এ বছর জুলাই মাসে জাতিসংঘ ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য UNMEE (United Nations Mission for Ethiopia and Eritrea) প্রেরণ করে।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

২০০০-২০১০: জাতিসংঘের জন্য ২০০০-২০১০ দশকটি তেমন সাফল্যজনক নয়। কেননা এ দশকে জাতিসংঘের কার্যক্রম একক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনেকটা মাথানত করে। ২০০১ সালে আল কায়েদা কর্তৃক আমেরিকার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার আক্রমণ ও ধ্বংসের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (Worldwide War Against Terrorism) চালু করে।

বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করার স্লোগান নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাক আক্রমণ ও তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের মজুদ রয়েছে এই অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন জোট হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করলেও জাতিসংঘ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করা ভিন্ন কিছুই করতে পারেনি। অথচ যুদ্ধের পর ইরাকে সে ধরনের কোনো অস্ত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর তালেবান সরকারকে 'আল কায়েদা নেটওয়ার্কের আশ্রয়দাতা' অভিযোগে উৎখাত করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন জোট নিরাপত্তা পরিষদকে পাত্তা না দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

২০১১-২০১৫: এ সময়কালেও জাতিসংঘের সাফল্য উল্লেখ করার মতো নয়, বিশেষ করে বৈশ্বিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে। সিরিয়ায় সংঘাত, ইরাক-মিশরে সংঘাত এবং সাম্প্রতিককালে আইএসআইএস এর উত্থান ও এর দমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী নীতির বিপরীতে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ভূমিকা প্রদর্শন করতে পারেনি। তবে এ প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ সালে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দান করে। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের আইসিসি ট্রিটিতে (The ICC Treaty) বলা হয়েছিল যে, ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্যালেস্টাইন আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল কোর্টের সদস্যপদ লাভ করবে। ইসরাইলের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়েছে।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ

জাতিসংঘ যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো মূলত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত-

ক) রাজনৈতিক

খ) অর্থনৈতিক

গ) সাংস্কৃতিক।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায়, বিগত প্রায় ৭ দশকে জাতিসংঘের রাজনৈতিক অর্জন খুব একটা উজ্জ্বল নয়। কেননা, এ সময়কালের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রায় সকল সিদ্ধান্তেই বৃহৎ শক্তিবর্গের ইচ্ছা বা বিরোধিতা প্রতিফলিত হয়েছে। সে তুলনায় সাংস্কৃতিক-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ত্রাণ-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এ সংস্থাটির ভূমিকা অতীব উজ্জ্বল। অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন- আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের ক্ষেত্রেও এ সংস্থাটি তেমন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি

টপিক – ০৪ জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

টপিক ০৪: জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

জাতিসংঘ গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি যতই পরিণতির দিকে যাচ্ছিল ততই এটি প্রভাতের মতো পরিষ্কার হচ্ছিল যে, অক্ষশক্তির পরাজয় ঘটতে যাচ্ছে এবং মিত্রশক্তির বিজয় আসন্ন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বে ৫টি রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এগুলো হলো- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চীন। এ ৫টি দেশ জাতিসংঘের মূল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। এর ফলে জাতিসংঘের যেকোনো কার্যক্রমে এ রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। এ রাষ্ট্রগুলোর একটি অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে আর তা হলো 'ভেটো' (Veto) ক্ষমতা, যার অর্থ হলো 'আমি মানি না'। এ ক্ষমতা বলে বৃহৎ শক্তিগুলো সৃষ্টিলগ্ন থেকেই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ নিজস্ব স্বার্থের পরিপন্থি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা ভেটো দিয়ে বাতিল করার সুযোগ গ্রহণ করেছে। যেমন- ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটলে বিপ্লবী চীনকে চিয়াং-কাই-শেক এর ফরমোজা সরকারের পরিবর্তে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ প্রদানের পক্ষে রাশিয়ার (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর ফলে নাকচ হয়ে যায়। আবার, ১৯৫০ সালে রাশিয়া হাঙ্গেরিতে আগ্রাসন চালালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তি নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করলে রাশিয়ার ভেটোর কারণে আলোচনা হতে পারেনি।

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকট সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৬টি প্রস্তাবে রাশিয়া ভেটো দেয়। ১৯৬০ সালে নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, জাতিসংঘ বাহিনী কঙ্গোর বৈধ সরকারের সাহায্যার্থে বেলজীয়বাহিনীকে কঙ্গো ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। কিন্তু বৃহৎ শক্তির অনীহায় সেই সিদ্ধান্ত জাতিসংঘ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ১৯৬২ সালে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সংকটকে কেন্দ্র করে দুই বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রবল বিরোধ উপস্থিত হলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ উভয় সংকটে পড়ে। এ সময় জাতিসংঘ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়।

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা মিত্রশক্তি ছিল তারাই জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পেয়েছিল। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই পরিচালনা করলেও খুব দ্রুত সে ঐক্যে ফাটল ধরে। যুদ্ধের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদের বিকাশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের বিকাশের লক্ষ্যে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করলে বিশ্ব তাদের প্রভাবে দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে ইতিহাসবিদগণ চিহ্নিত করেছেন Cold War (স্নায়ুযুদ্ধ) হিসেবে। উভয় শক্তি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ায় এবং উভয়েরই ভেটো ক্ষমতা থাকায় প্রতিনিয়ত দেখা যায় কোনো আন্তর্জাতিক সংকট উপস্থিত হলে দ্বিধাহীনভাবে এ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র বিবদমান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এর ফলে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রমে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অনবরত। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্স বরাবরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বন করেছে কিংবা ভেটো দানে বিরত থেকেছে। চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে থেকেছে কিংবা নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে। বিংশ শতকের সত্তর-এর দশকে এসে আবার দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই অপর ৪টি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে তার ভেটো ক্ষমতা দিয়ে লড়াই করেছে। এ সময় এক সময়ের পরাশক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদে তাদের ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

অপরদিকে, উদীয়মান পরাশক্তি হিসেবে চীন উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য সামরিক শক্তির পেছনে তার জাতীয় আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করতে থাকে এবং সামরিক শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে জাতিসংঘ ক্রমান্বয়ে এ দুই পরাশক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়। স্নায়ুযুদ্ধকালীন বহু আন্তর্জাতিক সংকটের ন্যায়সংগত সমাধান এ দুই বৃহৎ শক্তির পরস্পর বিরোধিতার কারণে সম্ভব হয়নি।

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

১৯৬৫ সালে ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে মার্কিন হামলা, ১৯৬৮ সালে সাইপ্রাস সমস্যা, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের আগ্রাসন, ভিয়েতনামে মার্কিন হামলা, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ এই দুই বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তবে জাতিসংঘের শক্তিশালী ভূমিকার কারণে এই দুই পরাশক্তি বহুবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত থেকে সরে আসতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। ব্রিটেন শুরুতে কৌশলগত অবস্থানে থাকলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিন নীতিকেই সমর্থন করেছিল। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে একাই লড়াই করতে হয়েছিল। বাংলাদেশ যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন পাকিস্তানের পরামর্শে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাস করার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা আনয়নের চেষ্টা চালায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ সময় তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়। ফলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন ভূমিকার মূল কারণই ছিল স্নায়ুযুদ্ধজনিত সোভিয়েত বিরোধিতা।

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরপর থেকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে মার্কিন প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'রাবার স্ট্যাম্প' এ পরিণত হয়েছে। ফ্রান্সে বর্তমানে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, রাশিয়া ৯০-পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের বিপর্যস্ত অর্থনীতি এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। চীন যদিও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় তার সামরিক শক্তি নগণ্য। এসব কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন কার্যত জাতিসংঘকে তার ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। মার্কিন চিন্তাবিদরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য Project for the New American Century (PNAC) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার উদ্দেশ্য হলো কোনো কোনো শিল্পোন্নত জাতির আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষমতা প্রয়োগ প্রতিহত করা। এ প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান জাতিসংঘের কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা চালাচ্ছে। জাতিসংঘের কাঠামো গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রসমূহের শক্তির নিরিখে।

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

বর্তমানে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছে। এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের বৈপ্লবিক সংস্কার কামনা করছে। এর প্রমাণ আমরা দেখেছি উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ, সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ, ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে তার নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে এবং পরবর্তীতে চাপ প্রয়োগ করে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে তার কার্যক্রমের বৈধতা আদায় করে নিয়েছে। এ প্রবণতা এখনও বিদ্যমান।

জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তির ভূমিকা

বর্তমানে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। রাশিয়া ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পরাশক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সে বিশ্বশক্তির মর্যাদা লাভ করবে। জার্মানিকে ইতোমধ্যেই প্রভাবশালী বিশ্বশক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে জার্মানির অংশগ্রহণ বেড়ে চলেছে। যেমন- ইরানের পরমাণু ইস্যুতে ছয়-জাতি আলোচনায় জার্মানি অন্যতম অংশীদার। তবে জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রাধান্য দূর করতে হলে বিকল্প শক্তি বা শক্তিসমূহের উত্থান প্রয়োজন। ইউরোপ অদূর ভবিষ্যতে এ ভূমিকা নিতে পারবে না বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সেদিক থেকে এশিয়াকেই সম্ভাবনাময় হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এশিয়ার চীন, ভারত, জাপান, ইরান যদি তাদের বর্তমান উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে পারে তবে জাতিসংঘে তাদের জোরালো ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। এর ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি

টপিক – ০৫ জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জ-এর মধ্যকার তুলনা

টপিক ০৫: জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জ-এর মধ্যকার তুলনা

This Topic is important for

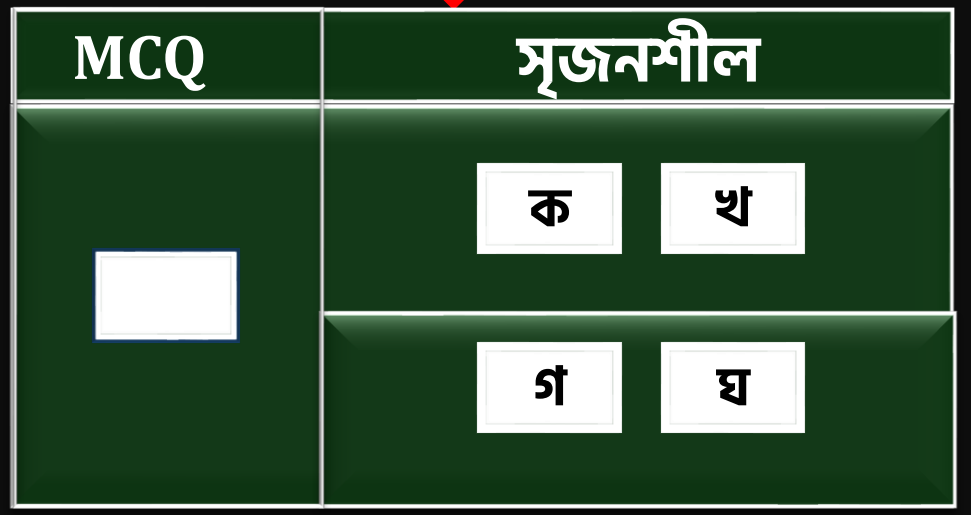

জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জ-এর মধ্যকার তুলনা

মানবসভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিশ শতক পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, লোকক্ষয়, যুদ্ধের ব্যাপকতা, বিভীষিকা ও বীভৎসতায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বিশ শতকের শুরুতে ও মাঝামাঝিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর এরূপ বিধ্বংসী যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ (League of Nations)। কিন্তু মাত্র দুই দশকের মধ্যেই এ আন্তর্জাতিক সংগঠনটি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এবং বিশ্ব আরেকটি প্রলয়ংকরী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই এর ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এ যুদ্ধ বন্ধ করা এবং বিশ্বকে এরূপ কোনো যুদ্ধ থেকে ভবিষ্যতে মুক্ত রাখার জন্য ভাবতে থাকেন। আর তা করতে গিয়েই পূর্বতন আন্তর্জাতিক সংগঠন 'জাতিপুঞ্জ'-এর ব্যর্থতার কারণও অনুসন্ধান করা হয়। এরপর অতীতের সব ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যৎ নিরাপদ পৃথিবী গঠনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ (United Nations) প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ববর্তী জাতিপুঞ্জের গঠনগত ত্রুটিগুলো দূর করা হয় এবং শক্তির ভারসাম্য আনয়নের চেষ্টা করা হয়। নিচে এ দুটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো উল্লেখ করা হলো:

জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জ-এর মধ্যকার তুলনা

প্রথমত, জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফার ভিত্তিতে। কিন্তু উইলসনের প্রস্তাবের মূল কতিপয় ধারা এ জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় উপেক্ষা করা হয়েছিল। উইলসনের শান্তি প্রস্তাব মেনে জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরিত্যাগ করেছিল কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানিকে কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি; এমনকি জাতিপুঞ্জেও তাকে কোনো সম্মানজনক স্থান দেয়া হয়নি অথচ তখনও এটি ছিল একটি পরাশক্তি। অপরদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ গঠনের সময় বিষয়টি দূরদৃষ্টির সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে পরাশক্তি ছিল ৮টি: ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, অস্ট্রিয়া, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানি। এর বেশিরভাগই ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং মূলত ইউরোপীয় শক্তিসাম্যের চিন্তা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। অপরদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৫টি পরাশক্তির উদ্ভব ঘটে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন। জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল পুরো বিশ্বের শক্তিসাম্যকে বিবেচনা করে।

তৃতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার চেয়ে জার্মানিকে শাস্তিদানই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জার্মানির ভবিষ্যৎ উত্থান রোধ করার জন্য তাকে ব্যবচ্ছেদ করে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে এবং এরূপ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য জাতিপুঞ্জ গঠন করা হয়েছিল। ফলে তা দীর্ঘদিন কার্যকর থাকেনি।

জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জ-এর মধ্যকার তুলনা

চতুর্থত, জাতিপুঞ্জের একটি দুর্বলতা এই যে, শুরু থেকেই উদ্যোক্তা হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর বাইরে থেকে যায়। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধিতা একটি প্রধান ইস্যু ছিল। এ ইস্যুতে মার্কিন সিনেটের নেতৃত্বের সাথে প্রেসিডেন্ট উইলসনের চরম তিক্ত সম্পর্কের কারণে সিনেট জাতিপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান সংক্রান্ত বিল অনুমোদন দেয়নি। এ সময় রিপাবলিকান পার্টি উইলসনের আন্তর্জাতিক নীতির চরম বিরোধী ছিল এবং তারা সিনেটে প্রবল বিরোধিতা করে। রাশিয়ার যোগদানও শুরুতে বাধাগ্রস্ত করা হয়। বিজিত জার্মানিসহ অন্য বিজিত রাষ্ট্রগুলোকে সদস্যপদ দেয়া হয়নি। ফলে জাতিপুঞ্জ সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সংগঠনের চরিত্র লাভ করতে পারেনি। অপরদিকে, জাতিসংঘে সব সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত রাখা হয়।

পঞ্চমত, জাতিপুঞ্জে সব রাষ্ট্রকে সমান মর্যাদার আসন দেয়া হয়নি। জাপান এ বিষয়টি উত্থাপন করে জাতিপুঞ্জের সব সদস্য রাষ্ট্রের সমান অধিকার দানের দাবি করলে ব্রিটেনের চাপে তা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু জাতিসংঘে প্রত্যেক জাতি ও রাষ্ট্রের সমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ষষ্ঠত, জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ও অবস্থান বারবার পরিবর্তিত হওয়ায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে, জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জ-এর মধ্যকার তুলনা

সপ্তমত, জাতিপুঞ্জ যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত তা বাস্তবায়ন করার জন্য নিজস্ব সামরিক বাহিনী ছিল না। কিন্তু জাতিসংঘ তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য তার অধীনে বাহিনী তৈরি করতে পারে, শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনা করতে পারে। এর ফলে, জাতিপুঞ্জের তুলনায় জাতিসংঘ অনেক বেশি সুসংহত।

অষ্টমত, জাতিপুঞ্জের আইনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করায় বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা যায়নি। জাতিসংঘ এক্ষেত্রে ভেটো ব্যবস্থা রেখেছে। ভেটো ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করলেও তা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নীতির তুলনায় অধিক কার্যকর।

নবমত, জাতিপুঞ্জের সংবিধানে যুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেবল আক্রমণাত্মক যুদ্ধকেই যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এর ফলে অনেক রাষ্ট্রই অঘোষিত যুদ্ধের দ্বারা নিজ দেশের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। কিন্তু জাতিসংঘের আইনে শুধু যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়া মাত্রই নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে।

দশমত, জাতিপুঞ্জের অপর দুর্বলতা এই যে, যেসব রাষ্ট্র এর সদস্য নয় সেসব রাষ্ট্রের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারত না। এর ফলে জাপান তার মনঃপুত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় লীগ পরিত্যাগ করে। অপরদিকে, জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের ওপরই বলবৎ করা যায়।

জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জ-এর মধ্যকার তুলনা

উপরের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিপুঞ্জ গঠন ও কার্যাবলির নিরিখে জাতিসংঘের মতো অতটা সুসংহত নয়। তাছাড়া জাতিসংঘের কর্মসূচিও অনেক ব্যাপক। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার, মানবকল্যাণসহ খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বিশ্ব আজ পোলিও, কলেরামুক্ত। বিশ্বে শিশু মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। নারীর অধিকার, নারী ও শিশুর পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশসমূহের পুনর্গঠন, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন ত্রাণ তৎপরতা জাতিসংঘের সাফল্যের চিহ্ন বহন করছে। তাই জাতিসংঘকে (১৯৪৫) জাতিপুঞ্জের (১৯১৯) এক উন্নত ও পরিমার্জিত সংস্করণ বলা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি

টপিক – ০৬ জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

টপিক ০৬: জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

যেসব মহান আদর্শকে সামনে রেখে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার সবটা না হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের ভূমিকা ইতিবাচক বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উঠে আসা এ সংগঠনটি দীর্ঘ প্রায় সাত দশক ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে এখনও যে সার্থকভাবে টিকে আছে এবং বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে আছে তা এর সাফল্যেরই পরিচয় বহন করে। এ সময়কালের মধ্যে বিশ্ব একাধিকবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, বিশেষ করে হাঙ্গেরি সংকট, সুয়েজ সঙ্কট, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। কিন্তু জাতিসংঘের সার্থক দূতিয়ালির ফলে পৃথিবী বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়। তবে এ সংগঠনটির ব্যর্থতাও কম নয়। জন্মলগ্ন থেকেই মার্কিন-সোভিয়েত স্নায়ুযুদ্ধের ফলে বহু সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায়নি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের ফলে এটি একটি রাবার স্ট্যাম্প সংগঠনে পরিণত হয়েছে বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের সাফল্যসমূহ (Successes of the United Nations)

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে জাতিসংঘ যেসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো-

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা (Upholding International Peace and Security): জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা রক্ষা করা ও বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা। ২০১০ সাল পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ সময়কালে জাতিসংঘ ৫৫টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং ১৫টি শান্তিরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন দেশে সক্রিয়ভাবে কার্যকর রয়েছে। এ সময়কালের মধ্যে প্রায় ১৭২টি যুদ্ধ সম্ভাবনার সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করেছে। যার মধ্যে ৮০টি সমস্যা বিদ্যমান দেশগুলোকে প্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছিল। এর মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার কারগিল সংঘর্ষ অন্যতম। ২০১৬ সাল পর্যন্ত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সংখ্যা ৬০টিতে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া জাতিসংঘ ১৯৫০ সালে কোরীয় সংকট, ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকট, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার, ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, লেবানন সংকট, এলসালভেদরে গৃহযুদ্ধ অবসান, বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সংকট ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ২০০১ সালে জাতিসংঘ নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

উপনিবেশ বিলোপ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (Abolition of Colony, Establishment of Democracy and Self-Governance): জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বহুদেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১১টি অঞ্চল জাতিসংঘের অছি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সবগুলোই স্বাধীনতা লাভ করেছে। কম্বোডিয়া, নামিবিয়া, এলসালভেদর, মোজাম্বিক, কঙ্গো, মিশর ইত্যাদি দেশে গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটেছে জাতিসংঘের সহায়তায়।

মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠা (Establishment of International Law and Human Rights): ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার পর থেকে জাতিসংঘ ৮০টির বেশি দেশের সাথে মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ নির্মূলে এবং প্যালেস্টাইনিদের স্বাধীন আবাস ভূমির দাবি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ সহযোগিতা করেছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান (Contribution to Economic, Social and Cultural Development): রাজনৈতিক ক্ষেত্রের চেয়ে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করার জন্য ৫টি অর্থনৈতিক কমিশন (ECA, ECE, ECLAC, ESCAP এবং ESCWA) গঠন করে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের দরিদ্র দেশগুলোতে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আবার সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য UNDP, UNESCO, UNICEF এর মাধ্যমে শিক্ষা, শিশুস্বাস্থ্য, বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেছে। ১৭০টির মতো দেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা খাতে জাতিসংঘ হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এর ফলে এসব দেশের দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান, শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

শরণার্থী সমস্যার সমাধান কার্যক্রম (Activities in Solving Refugee Problèm): জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR) ১৯৫১ সাল থেকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হত্যার ভয়ে পলাতক কোটি কোটি লোককে খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা সহায়তা প্রদানসহ এসব উদ্বাস্তুদেরকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় সোয়া কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিলে জাতিসংঘ তাদের সাহায্য প্রদান করে। মিয়ানমার সরকারের বৈরী আচরণে বাংলাদেশে চলে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদেরও জাতিসংঘ সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইউরোপ ও এশিয়ার উদ্বাস্তুদের সহায়তার জন্য জাতিসংঘ (UNHCR) কে যথাক্রমে ১৯৫৪ সালে এবং ১৯৮১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম (Activities in Environmental Preservation): বিশ্বকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি জেনেরো সম্মেলনে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতিরোধ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর দ্বারা CFC গ্যাস উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা কার্যক্রম (Population Control and Health Care Activities): জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮০ সালের মধ্যে বিশ্বকে গুটি বসন্তমুক্ত করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের' মধ্যে বিশ্বকে পোলিওমুক্ত করার ঘোষণা দেয় এবং সফল হয়। বর্তমানে UNICEF এবং WHO টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের কবল থেকে মুক্ত করার কার্যক্রম সার্থকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে ১৯৬০ সালে বিশ্বে যেখানে জন্মহার ছিল ৬%, ২০০৫ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩.৫%। এছাড়া জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দরিদ্র দেশের পল্লী এলাকার ১৩০ কোটি লোকের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

নারীর অধিকার সংরক্ষণ (Preservation of Women Rights): নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জাতিসংঘ ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত 'নারী দশক' পালন করে। এছাড়া ১৯৭৫ সাল থেকে কয়েক বছর পর পর জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি জাতিসংঘের মূল সনদে নারী-পুরুষ সমান অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ (Preservation of Labour-Rights): শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, তাদের স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও শিশুশ্রম বন্ধে ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ ILO কে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করে এর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধ (Drug Abuse and Trafficking Prevention): জাতিসংঘ তার 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি' (UNDCP) এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধ, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্য উৎপাদনকারীদের বিকল্প পেশায় স্থানান্তর করাও এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ (Preservation of Historical Place and Building): জাতিসংঘ তার অঙ্গ সংস্থা UNESCO এর মাধ্যমে বিশ্বের প্রাচীন ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপনা অনুসন্ধান করে তা সংরক্ষণের কার্যক্রম শুরু থেকেই চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে UNESCO বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১০৫২টি স্থানকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, ষাটগম্বুজ মসজিদ, সুন্দরবন, ভারতের তাজমহল, মিশরের পিরামিড, পেরুর মাচ্চু পিচ্চু এলাকা, ল্যাটিন আমেরিকার ইনকা সভ্যতা, আজটেক সভ্যতা ইত্যাদি সংরক্ষণ এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমস্যার সমাধান (Settlement of International Trade Conflict): জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য WTO (World Trade Organization) গঠন করে উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমঝোতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন (Establishment of International Court of Justice): দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সমস্যাসমূহের, আইনগত প্রক্রিয়ায় সমাধান, গণহত্যা, আন্তর্জাতিক অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করেছে। এ বিচারালয়ের এক রায়ে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

পরমাণু অস্ত্রবিস্তার রোধ (Control of the Expansion of Nuclear Weapon): জাতিসংঘ ১৯৬৮ সালে NPT এবং ১৯৯৬ সালে CTBT চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আনবিক সংস্থা IAEA গঠনের মাধ্যমে জলে-স্থলে-আকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করেছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত CTBT (Comprehensive Nuclear Ban Treaty) তে ১৮৪টি দেশ এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত NPT (Non-Proliferation Treaty)-তে ১৯১টি দেশ স্বাক্ষর করেছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের ব্যর্থতাসমূহ (Failures of the United Nations)

সাফল্যের পাশাপাশি বিগত প্রায় সাত দশকে জাতিসংঘের ব্যর্থতার পাল্লাও কম ভারী নয়। নিচে জাতিসংঘের ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হলো:

দরিদ্রতা দূরীকরণে ব্যর্থতা (Failure in Poverty Reduction): জাতিসংঘের অধীনস্থ বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিশনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে যে ঋণদান করা হয় সেগুলোতে এমন সব শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, এসব দেশের দারিদ্র্য দূর হওয়ার পরিবর্তে আরও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। আজও বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ দারিদ্রদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশকে প্রতিদিন একবেলা খাদ্যের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে।

মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থতা (Failure in Upholding Human Rights): বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন- ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, অধিকৃত কাশ্মির, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

বর্ণবাদ ও জাতিগত দাঙ্গা নিরসনে ব্যর্থতা (Failure in Controlling Racism and Communal Riot): জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়েতে বর্ণবাদী বিদ্বেষ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারেনি। এমনকি ২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত বর্ণবাদী রায় প্রদান করলে সেদেশে ব্যাপক বিক্ষোভ সংঘটিত হয় কিন্তু জাতিসংঘ কোনো নিন্দা প্রস্তাব আনতে পারেনি। মিয়ানমার, চীন, চেচনিয়া, কসোভোয় জাতিগত দাঙ্গা নিরসনেও জাতিসংঘ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্ররোধে ব্যর্থতা (Failure in Ceasing Arms and Nuclear Weaponry): জাতিসংঘ ১৯৬৮ সালে NPT এবং ১৯৯৬ সালে CTBT চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্ররোধের উদ্যোগ নিলেও খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র CTBT তে স্বাক্ষর না করলে জাতিসংঘ তাকে বাধ্য করতে পারেনি। ইসরাইল ও উত্তর কোরিয়া গোপনে পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হলে, ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটালেও জাতিসংঘ এসব দেশের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষায় ব্যর্থতা (Failure of Upholding Peace in Middle East): ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের মাঝে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়। কিন্তু এ বাহিনী এখন পর্যন্ত সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

ভিয়েতনাম ট্র্যাজেডি (Vietnam Tragedy): ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে আগ্রাসন চালালে প্রায় দশ বছর সেখানে লড়াই চলে। এতে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি ভিয়েতনামি এবং ৫৮ হাজারের মতো মার্কিন সৈনিক নিহত হয়। জাতিসংঘ এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লিবিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাক অভিযান (USA'S Invasion in Lybia, Afghanistan and Iraq): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক উদ্যোগে নিরাপত্তা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে ২০০১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়ায় অভিযান পরিচালনা করে সেসব দেশের সরকারকে উৎখাত করে। এসব যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করে। জাতিসংঘ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

বসনিয়ায় শান্তি মিশনের ব্যর্থতা (Failure of Peace-Commission in Bosnia): জাতিসংঘের জন্মের পরবর্তী পাঁচ দশকের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বসনিয়ায় তার শান্তিরক্ষা মিশনের ব্যর্থতা। বসনিয়ায় জাতিসংঘ বাহিনীর উপস্থিতিতেই সার্বরা বসনীয় মুসলমানদের ওপর হামলা চালিয়ে গণহত্যা পরিচালনা করে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

কসোভো, সোমালিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, জায়ারে ব্যর্থতা (Failure in Kosovo, Somalia, Ruanda, Burundy and Jayare): উপরিউক্ত রাষ্ট্রগুলোতে দিনের পর দিন জাতিগত দাঙ্গা সংঘটিত হলেও, বিশেষ করে কসোভোতে মুসলিম নিধন চললেও জাতিসংঘ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

লেবানন সংকট (Lebanon Crisis): লেবাননে ইসরাইলি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণ করেই তার দায়িত্ব শেষ করে; ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

কিউবা ও বার্লিন সমস্যা (Cuba and Berlin Problem): ১৯৪৮ সালে বার্লিন সমস্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। এদিকে ১৯৬২ সালে কিউবায় মিসাইল সংকট নিয়ে বিশ্ব বড় ধরনের যুদ্ধ ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। জাতিসংঘ এ দুটি বিষয়ে নির্বাক দর্শক ছিল মাত্র।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জন্মলগ্ন থেকে সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। প্রায় সাত দশক ধরে পৃথিবী যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের কবল থেকে মুক্ত রয়েছে এটিই এর বড় সাফল্য। যেসব ক্ষেত্রে এটি সফল হতে পারেনি তার কারণ হলো এর নিজস্ব সেনাবাহিনী না থাকা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ পরাশক্তিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলা। বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠায় জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে চিন্তিত। কেননা, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জাতিসংঘের বর্তমান কাঠামো মানতে প্রস্তুত নয় এবং সে বিশ্বে তার কর্তৃত্বের ভারসাম্য হিসেবে কোনো রাষ্ট্রের উত্থান ঘটতে দিতে চায় না। এরূপ পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া জাতিসংঘকে কার্যকর রাখার কোনো বিকল্প নেই।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ (Bangladesh & the United Nations)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল হতাশাজনক। ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘে 'গণহত্যা নিবৃত্তি ও শাস্তি বিষয়ক সনদ' গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে ঘৃণ্য গণহত্যা সংঘটিত করে তার জন্য জাতিসংঘ পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ তো দূরে থাকুক বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা প্রস্তাবও উত্থাপন করতে পারেনি। এসময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন বার্মার নাগরিক ড. উ থান্ট (D. U. Thant)। বার্মা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। ড. উ থান্টের কর্মতৎপরতায় তার নিজ দেশের মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি ১৯৪৯ সালের জেনেভা সনদে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধে মানবিক ব্যবহারের যে নিশ্চয়তা বিধান করা হয় সেই দায়িত্বও জাতিসংঘ পালন করতে পারেনি। এর একটি কারণ হলো জাতিসংঘ বৃহৎ শক্তিসমূহের রাবার স্ট্যাম্প হিসেবেই কাজ করেছে। জাতিসংঘের সনদ এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যে, বৃহৎ শক্তিসমূহের সমঝোতা ছাড়া কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের গণহত্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলেও জাতিসংঘ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জাতিসংঘ 'যে মানবিক কার্যক্রম চালায় তা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদন করার ফলে সাধারণ মানুষের কোনো কাজে আসেনি। প্রায় ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের যানবাহনসমূহ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাদের কাজে ব্যবহার করেছে এবং ত্রাণসামগ্রীও সেনা সদস্যরা আত্মসাৎ করেছে নতুবা রাজাকার কিংবা পিস কমিটির সদস্যরা আত্মসাৎ করেছে। এমনকি জাতিসংঘের ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পাকিস্তানি দালালেরা ব্যবসাও করেছে বলে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। শরণার্থী শিবিরের জন্য জাতিসংঘ যে অর্থসাহায্য করেছিল তাও প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই অপ্রতুল।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

প্রাথমিক ব্যবস্থা (Initial Steps)

১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এজন্য ২৫ মার্চের পূর্বেই জাতিসংঘের মহাসচিব ঢাকা থেকে তার সব কর্মীকে প্রত্যাহার করে নেন। ১ এপ্রিল জাতিসংঘ বাংলাদেশের মানুষের জন্য ত্রাণ সাহায্য পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ রেডক্রসের বিমানকেও ঢাকায় অবতরণ করতে দেয়নি। ২২ এপ্রিল জাতিসংঘের মহাসচিব পুনরায় ত্রাণ সাহায্য পরিচালনার অনুমতি চাইলে একমাস পর ইয়াহিয়া খান সে অনুরোধ রক্ষা করে। এ সময় পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় গণহত্যার ব্যাপক বিবরণ প্রকাশিত হলে জাতিসংঘ পাকিস্তানের এমন কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ৭ জুন থেকে জাতিসংঘ বাংলাদেশে তার ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের কার্যক্রম (The Activities of the United Nations): বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতিসংঘের কার্যক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

ক. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম;

খ. রাজনৈতিক সমাধান ও যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ;

গ. মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ;

ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার ও জাতিসংঘ;

ঙ. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

ক. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম (Humanitarian Assistance Program): মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২৫ মার্চের গণহত্যার পর থেকে বাংলাদেশ থেকে প্রাণভয়ে লাখ লাখ মানুষ ভারতীয় সীমান্তের দিকে ধাবিত হয়। ডিসেম্বর নাগাদ প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল জনগোষ্ঠী আর কখনও বাস্তুচ্যুত হয়নি।

১ এপ্রিল জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এক পত্রের মাধ্যমে জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করেন। ১২ মে তিনি ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালি শরণার্থীদের একটি তালিকা জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে হস্তান্তর করেন। ১৮ মে ভারত বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে মানবিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলে, পাকিস্তান তার বেসামরিক জনগণকে ভারতে ঠেলে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে যা তার একার পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ১৯ মে জাতিসংঘের মহাসচিব বিভিন্ন দেশের সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের কাছে শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

এ বিপুল জনগোষ্ঠীর ভরণ-পোষণের বিষয়টি জাতিসংঘের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। ফলে সরেজমিনে শরণার্থী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (UNHCR) প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান জুন মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ভারত-পাকিস্তান সফর করেন। ১২ জুন তিনি চুয়াডাঙ্গা ও বেনাপোলে স্থাপিত পাকিস্তান সরকারের দুটি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ১৫ জুন তিনি কলকাতা পৌঁছেন এবং ভারত সফর শেষে ২৩ জুন জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, "রাজনৈতিক সমাধানই শরণার্থীদের মনে আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে পারে"। তার এই স্বীকারোক্তির পর ভারত ও পাকিস্তানের ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয় করার জন্য জেনেভায় ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫১তম অধিবেশন বসে ৫ জুলাই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহাসচিব বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে ভারত ও পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেয়ার জন্য আহ্বান জানান। এ বৈঠকে তিনি বলেন যে, মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে ব্যাপক ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪০ কোটি ডলার প্রয়োজন কিন্তু বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে মাত্র ৯ কোটি ৯৪ ডলার। তবে সর্বসাকুল্যে জাতিসংঘের সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ২১৫ মিলিয়ন ডলার যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এক হিসাবে দেখা যায়, ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু শরণার্থীদের জন্যই ভারতের খরচ হয়েছিল ১,০০০ মিলিয়ন ডলার। আগা খানের বিবরণ অনুয়ায়ী জাতিসংঘের পণ্য সাহায্যের নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়:

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

১. খাদ্য সাহায্য- ৬,২৬৭ টন
২. যানবাহন- ২,২০০ টি
৩. ঔষধ সামগ্রী- ৭০০ টন
৪. আশ্রয় তৈরির জন্য পলিথিন- ৩০ লক্ষ শরণার্থীর জন্য যা প্রয়োজন।
৭ জুন জাতিসংঘ যখন ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে তখন জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থার নাম ছিল UNEPRO, ১৬ ডিসেম্বরের পর এর নাম হয় UNROD এবং ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ 'বাংলাদেশ' নামটি মেনে নিলে এর নাম হয় UNROB (United Nations Relief Operations Bangladesh) !

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

খ. রাজনৈতিক সমাধান ও যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ (Taking steps to stop the war and Political Solution): শরণার্থী সমস্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠলে জাতিসংঘের মহাসচিব ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে বাংলাদেশ ইস্যুটিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে তাদের জাতীয় স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করে। ফলে জাতিসংঘ যুদ্ধ বন্ধ এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নির্বিচার হত্যা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব (Proposal to Deploy observer): জাতিসংঘের মহাসচিব ১৯ জুলাই জাতিসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিদের কাছে সীমান্তের দুই প্রান্তে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন তদারকি করার জন্য পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব দিলে পাকিস্তান তা সাদরে গ্রহণ করে কিন্তু ভারত ও মুজিবনগর সরকার দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। কেননা তা হলে, পাকিস্তানের গণহত্যা এবং বাঙালির স্বাধীনতার বিষয়টি চাপা পড়ে যেত।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

নিরাপত্তা পরিষদে মহাসচিবের স্মারকলিপি (Secretary General's Memorandum at Security Council): ২০ জুলাই জাতিসংঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করেন যা মূলত পাকিস্তানের পক্ষে যায়। কেননা, তিনি তার স্মারকে ভারত-পাকিস্তানকে বিবদমান পক্ষ ধরে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করেছিলেন। তার প্রস্তাবে, বাঙালির ন্যায্য অধিকারের দাবি, অতঃপর পাকিস্তানের গণহত্যা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বাস্তব ইস্যুগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। এমনকি তিনি তার স্মারকে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্ত করেননি।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘ মহাসচিবের Good Office প্রস্তাব (Good Office Proposal of the United Nations Secretary General): অক্টোবরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন জাতিসংঘের মহাসচিব আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০ অক্টোবর তিনি ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশকে তার Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের এ উদ্যোগের একটি ত্রুটি এই যে, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটিকে ভারত-পাকিস্তান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যা পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। কিন্তু বাস্তবে এটি ভারত-পাকিস্তান সমস্যা ছিল না। এটি ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ এবং তাদের জাতিগত অস্তিত্বের প্রশ্ন। পাকিস্তান এ প্রস্তাব একদিন পরই গ্রহণ করে। তবে এ প্রস্তাবে উত্তর দিতে ভারত কিছুটা সময়ক্ষেপণ করে। এরপর ১৬ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী কৌশলে জাতিসংঘের মহাসচিবকে জানান যে, তার উচিত হবে ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিবের বিরুদ্ধে মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কৌশলে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে রক্ষা করার চেষ্টার অভিযোগ করেন। এতে মহাসচিব বিব্রতবোধ করেন এবং ২২ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক পত্রে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

গ. মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ (Mujibnagar Government and the United Nations); ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শপথ নেয়ার পর মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, "বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন, সার্বভৌম ও শান্তিকামী একটি দেশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান পাওয়া আমাদের জন্মগত অধিকার।"" কিন্তু জাতিসংঘ মুজিবনগর সরকারকে কোনো স্বীকৃতি প্রদান করেইনি বরং ১৯৪৯ সালের জেনেভা সনদে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধে মানবীয় ব্যবহারের যে নির্দেশনা রয়েছে তা পালিত হচ্ছে কিনা সেটাও তদারক করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবে জাতিসংঘ ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাঙালি শরণার্থীদের ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিয়েছে। মুজিবনগর সরকারের অস্তিত্বের ব্যাপারটি জাতিসংঘ সবসময় তার আলোচনায় এড়িয়ে গেছে এবং বিষয়টিকে ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে আগস্ট মাস থেকে মুজিবনগরের প্রতিনিধির সাথে জাতিসংঘের পত্র যোগাযোগ শুরু হয়।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসলে মুজিবনগর সরকারের-১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল জাতিসংঘে গমন করেন। এ প্রতিনিধিদলের প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের অধিবেশনে একটি পত্র পাঠ করার অনুমতির আবেদন জানালে এ অনুমতি দেয়া হবে কিনা তার ওপর একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক দুটো প্রস্তাব উত্থাপন করেন:

ক. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদের ডকুমেন্ট হিসেবে বিলি করা হোক;

খ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পরিষদে বক্তব্য রাখার অনুমতি প্রদান করা হোক।

এ নিয়ে প্রবল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। চীন এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। তবে শেষ পর্যন্ত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদের ডকুমেন্ট হিসেবে বিলি করার সিদ্ধান্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ যেহেতু কোনো স্বীকৃত রাষ্ট্র ছিল না, সেজন্য মুজিবনগরের প্রতিনিধিদের জাতিসংঘ অফিসে প্রবেশ ছিল খুবই কষ্টকর। এ জন্য জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ড. যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহায়তায় মুজিবনগরের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ অফিসে প্রবেশ করতেন। প্রবেশপত্রে শুধু তারিখ থাকতো; কোনো স্থান বা সময়ের উল্লেখ না থাকায় মুজিবনগরের প্রতিনিধিবর্গ ইচ্ছামতো যেকোনো স্থানে ঢুকে তদবির করতেন।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার ও জাতিসংঘ (Trial of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the United Nations): বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট পাকিস্তানের করাচির মিয়ানওয়ালী কারাগারে অন্তরীণ বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু করে। পরদিন জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট এ বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে স্পষ্টভাবে তার উদ্বেগের কথা জানান। তিনি তার বার্তায় বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের প্রশ্নটি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তিনি এ বিষয়টিকে শুধু পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ারাধীন বিষয় হিসেবে না ভেবে বরং রাজনৈতিক গুরুত্বসহ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। তার উদ্যোগেই International Commission of Justice আগস্ট মাসে এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো রকম গোপন বিচারের ব্যাপারে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দেয়। তারপরও পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু করলে ১৮ আগস্ট জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের অফিসের ডাইরেক্টর ব্রায়ান ই উরকুট বরাবর আবেদনপত্রে প্রখ্যাত আইনজীবী মওদুদ আহমেদ বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ২৭ আগস্ট মওদুদ আহমেদকে লেখা পত্রে উরকুট জানান যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার জন্য তারা সম্ভাব্য সবকিছু করছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিবের দৃঢ় অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক জনমতের প্রবল চাপে পাকিস্তান সরকার গোপন বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রাণ হরণ করতে সক্ষম হয়নি।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

ঙ. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান (The Recognition of Bangladesh): আন্তর্জাতিক আইনে কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়টি একটি ব্যাপক ধারণা, কেননা এর সাথে শুধু যে আইনগত বিষয় জড়িত তাই-ই নয় এর সাথে রাজনৈতিক বিষয়ও জড়িত। আন্তর্জাতিক সমাজে যখন কোনো একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তখনই এর স্বীকৃতির প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্য মুজিবনগর সরকার তার ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তৎপর হয়। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, শপথ গ্রহণের পরপরই বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "Pakistan is now dead and buried under a mountain corpse... We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood." (পাকিস্তান এখন মৃত। এটি এখন পর্বতপ্রমাণ মৃতদেহের স্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। আমরা তাই আমাদের জাতীয়তার সংগ্রামে নৈতিক ও উপকরণগত সহায়তার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের নিকট উদাত্ত আহবান জানাই।)

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের এই স্বীকৃতির দাবি অযৌক্তিক ছিল না। কেননা একটি নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য যেসব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তার সবগুলোই বাংলাদেশ পূরণ করেছিল। আন্তর্জাতিক আইনবিদ লটারপ্যাক্টষ্ট (Lauterpacht) যে চারটি শর্তের কথা বলেছেন, যেমন- ক) নতুন রাষ্ট্রটির প্রতি ঐ রাষ্ট্রের জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য অর্জন; খ) সরকারের স্থায়িত্ব; গ) সরকারের কার্যকারিতা; ঘ) সরকারের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা- তার সবগুলোই বাংলাদেশ পূরণ করেছিল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে যে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রটির উদ্ভব হয় তার প্রতি বাঙালির অকুন্ঠ সমর্থন ছিল; প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল প্রতিটি বাঙালির প্রাণের দাবি। বাংলাদেশের প্রথম সরকার ছিল মুজিবনগর সরকার। এই সরকারের প্রতি আপামর বাঙালির ছিল নিরঙ্কুশ সমর্থন। এই সরকারের স্থায়িত্ব নিয়েও কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না। কেননা এই সরকারে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ছিলেন। তাছাড়া এরা সবাই ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরীক্ষিত সৈনিক। এই সরকার কার্যকরভাবে একটি জনযুদ্ধ পরিচালনা করছিল এবং শুরুতেই মুজিবনগর সরকার তার পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছিল, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।' এই সরকার সকল আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সকল আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

বাংলাদেশ জাতিসংঘের কাছে তার স্বীকৃতির জন্য যে আবেদন করেছিল তার যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সমর্থক কতিপয় ইউরোপীয় ও এশীয় রাষ্ট্রের বিরোধিতায় বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের পূর্বে সরকারিভাবে কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। তবে বাংলাদেশের স্বীকৃতির পক্ষে বিশ্বে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। এর ফলে ১৯৭১ সালের মে মাসে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে যে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি আব্দুস সামাদ আজাদ অংশ নেয়ার সুযোগ পান। এটিও ছিল এক ধরনের স্বীকৃতি। ১৯৭১ সালের ১৬ জুন ব্রিটেনের শ্রমিকদলের ১২০ জন এমপি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ৯টি দেশ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের উদ্যোগ নিলে ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। এ বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য দেয়ার অনুমতি চেয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট-এর কাছে একটি পত্র দেন।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে নথিভুক্ত হয়। সভা শুরু হলে সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক প্রস্তাব করেন যে, বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য শোনা উচিত। কিন্তু চীনা প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে 'পাকিস্তানের বিদ্রোহী প্রতিনিধি' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করেন। এ সংক্রান্ত একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলে সভার সভাপতি একটি বুলিং প্রদান করেন যাতে বাংলাদেশ প্রতিনিধির পত্র পাঠ করার অনুমতি দেয়া হলেও বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধিকে অধিবেশনে অংশ নেয়া কিংবা বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে জাতিসংঘ কার্যকর কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি। বাংলাদেশের জনগণকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সশস্ত্র যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমেই তার স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হয়েছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সামনে যে সমস্যাটি ছিল তা হলো এর সনদের ২/৭ ধারা। এই ধারায় কোনো রাষ্ট্রের জনগণের মানবাধিকার বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতির মধ্যে সীমারেখা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রশ্নে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিরোধিতা করে। অপরপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, পোল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্র পাকিস্তানি বর্বরতা ও গণহত্যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু জাতিসংঘ রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার যুক্তির প্রশ্নে বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

THANK YOU